সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গল্পব্বি

তপোধীর ভট্টাচার্য

প্রসিদ্ধ বয়ানতত্ত্ববিদ রোলাঁ বার্ত 'The Pleasure of the Text' বইতে প্রচ্ছলে গল্প রচনার তাৎপর্য সম্পর্কেএই মীমাংসা প্রস্তাব করেছেন 'Isn't story telling always a way of searching for one's origin, speaking one of conflicts with the law, entering into him dialectic of tenderness and hatred?' (১৯৭৫ - ৪৭)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২ - ১৯৭১) - এর ছোটগল্প সম্পর্কে পড়ুয়ার প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে ঐ প্রশ্নটি মনে এল কেন? মনে এল, কারণ, বহুশ্রুত এই লেখক ছিলেন বাচনের সচেতন স্থপতি। শুধুমাত্র গল্প বলার জন্যে লেখেননি তিনি; তাঁর অন্বিষ্ট ছিল অণু - পরিসরে বিম্বিত বৃহত্তর জীবনবোধের বিন্যস্ত ও সংবেদনশীল বয়ান। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে যতটা জানি আমরা, গল্পকার হিসেবে ততখানি নয়। তাহলে উপন্যাসের প্রতিবেদনে শৈল্পিক সামর্থ্য প্রমাণ করেও তাঁকে কেন ছোটগল্পের মতো শিল্পমাধ্যমও ব্যবহার করতে হল? এমন কিছু অনুভব কি ছিল তবে, যাদের প্রকাশ করার জন্যে ছোটগল্পই হতে পারে সবচেয়ে সার্থক মাধ্যম! লালসালু (১৯৪৮) উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার চার বছর আগে কলকাতা থেকে যে নয়নচারা (১৯৪৫) নামে ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশ পেয়েছিল, তা নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ। এইটুকু স্পষ্টবোঝা যাচ্ছে, অন্তত উপন্যাস লিখতে - লিখতে স্বাদ বদলের জন্যে বা একঘেয়েমিকাটানোর জন্যে ছোটগল্প লেখা শু করেননি ওয়ালীউল্লাহ্। বরং ছোটগল্প তাঁর সচেতন শিল্পবোধ ও প্রস্তুতির ফসল।

প্রথম গল্পসংকলন থেকে দ্বিতীয় গল্পসংকলনের দূরত্ব অবশ্য কুড়ি বছর। ইতিমধ্যে 'লালসালু' ছাড়া বেরিয়েছে তিনটে নাটক 'বহিপীর (১৯৬০), 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৫) এবং একটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), দ্বিতীয় বা শেষ গল্পসংকলন হল 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫)। এর তিন বছর পরে বেরিয়েছে 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) নামে উপন্যাস। তাঁর বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্প থাকলেও সংকলন আর বেরোয়নি। গল্পসমগ্র (১৯৭২) প্রকাশিত হল বলে ওয়ালীউল্লাহের সম্পূর্ণ গল্পব্বি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।

বিখ্যাত প্রাবন্ধিক হায়াৎ মামুদ গল্পসমগ্রের সুলিখিত ভূমিকায় উপসংহারে পৌঁছেছেন এই প্রাজ্ঞোক্তি করে 'কাহিনী মানেই শুধু ঘটনার আড়ম্বর নয় এবং ঘটনাহীন জীবনেরও কাহিনী থাকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই জীবনকাহিনীরই স্থপতি।' এখানে বলেনেওয়া ভালো, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সূত্রে তিনি জীবনের তাৎপর্য এমনভাবে বুঝে নিয়েছিলেন যার সঙ্গে সাধারণ ধ্যান - ধারণার পার্থক্য অনেকখানি। তাঁর বাবা সরকারি চাকরি করতেন। এত ঘনঘন তাঁকে বদলি করা হত যে বাল্যে ও কৈশোরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মন কোথাও থিতু হতে পারেনি। যথাপ্রাপ্ত অবস্থান যেহেতু মানুষের আস্তিত্বিক বোধ ও চারিত্রিক প্রবণতার নিয়ামক, নিঃসীমএকাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁর সত্তার অভিজ্ঞান। তিনি নিজেকে বহুবার ত্রিশঙ্কু, নিঃসঙ্গ ও বিবিক্ত স্বভাবের মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে একটি চিঠিতে লিখেছেন তিনি 'মানুষের নিঃসঙ্গতাই আসল ও খাঁটি রূপ হয়তো। কোনো প্রকার উচ্ছ্বাস আমার ভালো লাগে না, ভাবালুতা তো বরদাস্তই করতে পারি না।' এমন নয় যে নিজের ছাঁচে তিনি গোটা জগৎকে ঢালাই করে নিতে চান। কিন্তু যাঁর কাছে জীবনের বস্তুরূপের বদলে সত্যরূপ বেশি কাঙ্ক্ষিত, তিনি যেন কাহিনির প্রচলিত ধরনে

সন্তুষ্ট থাকবেন না --- তা সহজেই অনুমেয়। আবার নিছক শিল্পসৃষ্টির ইচ্ছেতেও লেখেননি; যে - সমাজের তিনি বাসিন্দা সেই সমাজের জীবনসত্য অন্তরঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করাই ছিল তার অভিপ্রায়। বলা ভালো, যথাপ্রাপ্তের পুনর্গঠন করার জন্যে বিশ্লেষণ।

প্রাগুক্ত জনের কাছেই চিঠিতে তাই লিখেছিলেন 'সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা -- সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেলে সে আবার লেখা! আপনা থেকে যা বেবে তা-ই খাঁটি। ..... I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে --- আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম passion থেকে একটা চূড়ান্ত অবস্থা, সেই অবস্থা নিয়ে লিখে অ ামার লেখা কলঙ্কিত করতে চাই। .... পশ্চিম জগৎ আজ যতখানি এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরি। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্যে য ারা পিছিয়ে আছে। তাতে আমার ক্ষোভ নেই।' অবশ্য সব সময় যে লেখকের কথার সায় দিতে হবে, তা কিন্তু নয়। যেমন এ - চিঠির শেষ দিকে ওয়ালীউল্লাহ্ যা লিখেছেন, তা কেউ মেনে নেবেন না। কেন না তাঁর লেখা মোটেই পিছিয়ে থাকেনি। বরং তিনটে উপন্যাসেই তাঁর অনন্য লিখনশৈলী প্রমাণ করেছে, চিন্তা মূলত প্রযুক্তি। আর, চিন্তা - প্রযুক্তির সর্বাধুনিক উদ্ভ াসন প্রয়োগ করার ব্যাপারে তিনি ইতস্তত করেননি কখনও। তিনি সমৃদ্ধ পাঠ - অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন, সাহিত্যের অনুবিশ্ব জীবন মূলত নির্মিতি এবং সেই নির্মিতি সার্থক হতে পারে সাম্প্রতিক তত্ত্ব - ভাবনায় পরিশীলিত অস্তিত্বের আবিষ্ক ারে ও পুনর্ভাষ্যে।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে - (১৯৪১) ওয়ালীউল্লাহের প্রথম ছোটগল্প "হঠাৎ আলোর ঝলকানি" প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর অনুষঙ্গ যদি উপেক্ষা করি, বলতে পারি তাঁর গল্পবিশ্ব নির্মাণে পরবর্তী কালে ঐ অভিধার ভেতরকার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গল্পটি অবশ্য পাওয়া যায়নি; তবে এইটুকু বুঝতে পারি, তাঁর সৃষ্টিকর্ম আকস্মিক কোনো ব্যাপার ছিল ন া। আপন সত্তার গভীরে মন্থনবেলাকে লালন করেছিলেন তিনি। উনিশ থেকে চবিবশ বছর বয়সের মধ্যে প্রস্তুতিপর্বের ছে াটগল্পগুলির লেখা হয়ে গিয়েছিল। এদের বিষয়গত বৈচিত্র্য খুব বেশি নয়; তবে গল্পভাষা ও প্রকরণ - ভাবনার সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। আর, বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল বাঙালি মুসলমান সমাজের একান্ত নিজস্ব সংকট, অনন্বয়, শূন্যতা, কূটাভাস তঁ ার গল্পবীক্ষার প্রধান অবলম্বন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাযে একবাচনিক এবং রৈখিকতায় আক্রান্ত, তা চে াখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন তাঁর আবির্ভাব। ইতিহাসের অমোঘবাস্তব যখন বহির্জগৎ ও তার চেনা অবয়বকে আমূল বদলে দিচ্ছে, ব্যক্তির অন্তর্জগৎও অটুট থাকছে না। সময়ের উপস্থিতি কীভাবে যথাপ্রাপ্ত অবস্থায় তুমুল বিনির্মাণের মধ্যে প্রকাশ পায় -- সেদিকে তর্জনি সংকেত করার জন্যে ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাস নয় শুধু, ছোটগল্পেরবয়ানও ব্যবহার করেছিলেন। রূপান্তরের সময়ে বাস্তবের সমান্তরালভাবে অন্তর্বাস্তবেও কত জটিল ধুপছায়া সঞ্চারিত হয় তা নিবিষ্টভাবে লক্ষ করেছেন তিনি। কতরকম ভাবে সাধারণ মানুষেরা যে উন্মোচিত হয়েছে কথকতার নিপুণ বিন্যাসে, তার ইয়ত্তা নেই। বলা হয়েছে, চেতনাপ্রবাহ রীতিকে তিনি সঞ্চারিত করেছেন ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে। আর, 'আশর্চ্য সংযত সংহত নিত্তেজ গভীর গম্ভীরতার রচনা। তাঁর ভিত্তি বাস্তবায়িত, কিন্তু দুর্গের শীর্ষে পাখির মতো, তাঁর উড়াল কোনে া গহীন প্রতীকতায়। .....গূঢ়ভাষী এই কথকের রচনায় নিয়তি ও বস্তু - পৃথিবী, চাঁদ ও জলধারা, জীবন ও মৃত্যুচেতনা মিলেছে এক করতলে এসে।'

।।দুই ।।

ওয়ালীউল্লাহ্ সময় ও পরিসরের সন্ধি- বিসন্ধি অনুশীলন করতে গিয়ে জোর দিয়েছেন মানুষের ওপর। ইতিহাসের ঘূণ াবির্তেমাঝে - মাঝে মানুষ খড়কুটোর মতো ভেসে যায়, উৎখাত হয়ে যায় আজন্ম - লালিত বিশ্বাস ও স্থিতিশীলতা থেকে; তবু মানুষই খুঁজেনেয় নতুন আরম্ভের বয়ান। বাঙালির ইতিহাসের চরম বিনিপাতের পর্বে হিন্দু - মুসলমান বিভাজনের মেধাগ্রাসী স্মৃতিগ্রাসী চেতনাগ্রাসী বিষবাষ্প যখন সর্বত্রব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, ধর্মীয় পরিচয় হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের নিয় ামক, সেই দুঃসময় সংবেদনশীল সাহিত্যস্রষ্টার জন্যে ছিল পরীক্ষাও সময়। অনালোকিত মুসলমান সমাজের ভেতর ও বা হিরকে শিল্পের আধেয় করে তোলার মানে 'মুসলমানি সাহিত্য' রচনা নয়, বরং বাঙালির খণ্ডিত পরিচয়কে সম্পূর্ণতা দান এই পাঠ নিই ওয়ালীউল্লাহের কাছে। বুঝি, বিশ্বাসে আন্তর্জাতিক অথচ মননে স্বাদেশিক এই কথার বাঙালির বোধবিশ্বকে

পূর্ণ করে তোলার তাগিদে অকর্ষিত পরিসরে শিল্পবীজ বপন করেছিলেন। তাঁর কাঙিক্ষত ছিল বাঙালি মুসলমানের আত্মিক ভুবন আবিষ্কার ও তাকে শিল্পের পদবি দান। কাজটা এইজন্যে দুরূহ ছিল যে, যাদের জন্যে লিখছেন, ইতিহাসের সেই ধুলিসমাচ্ছন্ন দিনগুলিতে তারাই ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হয়ে, নতুন সাহিত্যকর্মকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তৈরি ছিল না। ওয়ালীউল্লাহ্ কী কঠিন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সময় থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে, আমরা আজ তা অনুমান করতে পারি।

একদিকে ছিল বাংলা সাহিত্য মানে বাঙালির হিন্দুর সাহিত্য এবং সেইজন্যে তা মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী -- এই মনোভাব। আর, অন্যদিকে খাঁটি ঐীমিক সাহিত্য নির্মাণের জন্যে বাঙালিত্বের সব চিহ্ মুছে ফেলার উৎকট উদ্যোগ কেন না সহজ সমীকরণ অনুযায়ী বাঙালি মানে হিন্দু। এই যুক্তিহীন গোড়ামি প্রশ্রয় পেয়েছিল দীর্ঘমেয়াদি অন্ধতায় যেহেতু বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারায় মুসলমান সমাজকে দূরীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত অপর হিসেবে প্রান্তিকায়িত করে রাখা হয়েছিল। এই নিঃশব্দ সাম্প্রদায়িক বিভাজন আজও, একুশে ফেব্রুয়ারি এবং বাংলাদেশের জন্ম সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা বিদ্যাচর্চায় নিরঙ্কুশ। বাংলা সাহিত্য যে হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে এক ও অবিভাজ্য বাঙালি সত্তার সৃষ্টি -- এই উপলব্ধি আমাদের পাঠক্রমে প্রতিফলিত হয় না। কৃত্তিবাস ও আলাওল, বৈষ্ণব পদাবলী ও ইউসুফ - জুলেখা, বঙ্কিমচন্দ্র ও মীরমশাররফ হোসেন, জীবনানন্দ ও নজল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শামসুর রাহমান তাই বিন্যস্ত হচ্ছেন স্বতন্ত্রর স্থানে। 'আমরা' এবং 'এরা'র বিভাজনকে চিরস্থায়ী করলেই বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশি সাহিত্য নামে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বিভেদমূলক অভিধা অব্যাহত থাকে। ওয়ালীউল্লাহের রচনাকে তাই গ্রহণ করতে হবে ঐ বিভেদমূলক সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রতিষেধক হিসেবে।

সুতরাং মুসলমান সমাজের কথা লিখেছেন বলে তাঁকে মুসলমানি সাহিত্যের কর্ণধার বলব না; বরং ভাবব, বাংলা সাহিত্যে অন্তেবাসীজনদের তিনি দিয়েছেন প্রাপ্য মর্যাদা। এতে আমাদের সাহিত্যের রিক্ততা ও অপূর্ণতা দূর হয়েছে অনেকখানি। বাঙালির মধ্যেমানুষের যে - অবয়ব ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিল, ওয়ালীউল্লাহ্ আসলে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিজস্ব পথ খুঁজে নিয়েছেন। আবার এখানেই লুকোনো ছিল অনতিক্রম্য কূটাভাসও। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের অস্থির দিনগুলিতে পাকিস্তান নামক সব - পেয়েছির - দেশের কল্পনায় বুঁদ হয়েছিল যে - সমাজ, একবাচনিকতার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সেই সমাজে নতুন সাহিত্যের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণের তেমন কোনওতাগিদই ছিল না। সামাজিক - রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল ও উৎকেন্দ্রিক। জীবিকাসূত্রে ওয়ালীউল্লাহ্ দীর্ঘ প্রবাস - জীবন যাপন করতেন বলে বিপ্রতীপ দর্পণে স্বদেশকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। সে - সময়কার আরেক দিকপাল লেখক শওকত ওসমানের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ভাবী স্ত্রী অ্যান মারির কাছে চিঠিতে শওকতের এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন' 'you must not be depressed. We must create an oasis in the sea of stupidity, greed, meanness and ignorance and live there in the Oasis. For that one must work. Anything. Do anything, impossible thing. Write anything that comes to your mind. Live in the Oasis. So that you can breathe, and work. You will not be depressed.'

নিঃসন্দেহে ওয়ালীউল্লাহ্ ঐ মদ্যানের স্থপতি হতে পেরেছিলেন। জীবনের আশর্চ্য সব নির্যাস শুষে নিয়ে নানা ধরনের ফুলও ফোটাতে পেরেছিলেন। যেসব মানুষের ছবি এর আগে বাংলা সাহিত্যে তেমন দেখা যায়নি, তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজস্ব মহিমায়। 'নয়নচারা'র পর্যায়েই দেখা গিয়েছিল, ওয়ালীউল্লা্ প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবন - সত্যের বিচ্ছুরণ থেকেমানুষের অভিনব পরিচয় উন্মোচনে আগ্রহী। প্রতীচ্যের বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে তাঁর ছোটগল্পের প্রতিবেদনে সচেতন কাকৃতির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত কথকতার আধেয় ও অন্বিষ্ট হল মানুষের দ্বন্দ্বময় ও বহুবাচনিকআবহ। বস্তুত ওয়ালীউল্লাহের গল্পবিশ্ব যত পরিক্রমা করি, মানুষের বিচিত্র অবস্থানজনিত প্রায় অন্তহীন উচচাবচতা ও কৌণিকতা নজরে আসে। বুঝতে পারি, ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ, সপ্রতিভ ও ব্যঞ্জনাগর্ভ বিন্যাসে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরের আততি যত চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হয়, ততখানি আর কোনও কিছুতেই নয়। মনে আসে নোয়াম চমস্কির একটি মন্তব্য 'It is not unlikely that literature will for ever give far deeper insight into what is sometimes called the full human person than any modes of scientific enquiry may hope to do.'

।। তিন ।।

জীবন সম্পর্কে নিত্য নতুন জিজ্ঞাসা উদ্বোধিত করা যদি হয় কথাকারের লক্ষ্য, তাহলে ওয়ালীউল্লাহ্ নিঃসন্দেহে সার্থক স্রষ্ট। তিনি মানুষের অস্তিত্বগত ছায়াঞ্চল ও অন্ধকার দেখেন, আবার আলোর ইশারাও দেখেন। তিনি দেখেন অস্তিত্বের ন ানাবিধ কূট সংশয় ও মীমাংসাহীন গোলকধাঁধা, তেমনি দেখেন পরিচ্ছন্নতার তৃষ্ণাও। অ্যান মারি তাঁর স্বামীর শিল্প - জিজ্ঞাসা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন 'He often said he wanted to write about a clean man!' উপন্যাসের বিপুল পরিসরে মানুষের শুদ্ধতা বা পরিচ্ছন্নতার জন্যে দীর্ঘ জটিল পথ পাড়ি দেওয়ার বিবরণ দেখানো যায় হয়তো, কিন্তুছোটগল্পে থাকতে পারে শুধুমাত্র সেই প্রয়াসের ইশারা কিংবা প্রয়াসের একটি দু'টি স্তর। অথবা প্রয়াসের প্রস্তুতি। ছে াটগল্প যিনি লেখেন, তাঁর পক্ষে কাজটা খুব সহজ নয়; তবুও তিনি নানা স্বরন্যাসে অফুরান প্রয়াসের বার্তাই পৌঁছে দেন প াঠকের কাছে। যাদের অস্তিত্বে পরিচ্ছন্নতা বা সঙ্গতি নেই, তাদের উপস্থাপনায় কোনও নেতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না, বিপ্রতীপের দর্পণে পরিচ্ছন্নতার আস্তিত্বিক ও সামাজিক প্রয়োজন প্রকট হয়। ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে সূচনাপর্ব থেকেই কাহিনি উপলক্ষ মাত্র; গল্পবীক্ষার অন্তর্দীপ্ত উপস্থাপনায় জীবনের গভীরতর আকরণ স্পষ্ট হচ্ছে কিনা --- এটাই গুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পে কথাবস্তুর সূত্রে বিষয় একটা থাকেই, থাকে প্রকরণও। এদের অনন্যতা পরীক্ষিত হয় অস্তিত্বের সংবিদ জাগানে ার বিশিষ্টতায়। বাস্তবের পরিসরে অন্তঃক্ষয়ী সমান্তরাল প্রকল্পনার উপস্থিত আবিষ্কারে। ওয়ালীউল্লাহ্, যে মন্বন্তর - বিষয়ক ছোটগল্পেও এমন দ্বিরালাপের অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছেন, তা তাঁর দৃষ্টিকে রঞ্জনরশ্মির সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নয়নতারা' গল্পের অনবদ্য প্রারম্ভিক বাচনের উল্লেখ করতে পারি 'ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ুরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ুরাক্ষী রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল - কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু - একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু - বিন্দু লালচে আলোসহ আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু - মৃদু জ্বলে।' এই যে চিহায়িত গল্পভাষা, তা বাস্তব অধিবাস্তবের মধ্যে সেতু গড়ে তোলে অনায়াসে। হায়াৎ মামুদ একেই বলেছেন 'আমাদের সাহিত্যে দোসরহীন'। তবে তা বহুমাত্রিক হলেও অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ নয়। চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটগল্পের ভাষায় অন্তর্বয়নের এমন সমৃদ্ধি, কাব্যিকতার এমন অন্তর্দীপ্তি অভাবনীয় ছিল। গল্পভাষা যে নিছক বিবরণ দেয় না এবং কাহিনির দাসত্ব করে না--- বরং সংকেতের আলো জ্বেলে দেয় --- সেদিনকার বাংলা সাহিত্যে এই উপলব্ধি খুব বেশি দেখা যায়না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ বাস্তব কেবল লঘুভার সাংবাদিক গদ্যের আশয় নয়, তাতে মানবিক অস্তিত্বের নিবিড়তর কোনো ইশারাও খুঁজতে হয় --- এই হল গল্পকারের অভিমত। তাই তো 'নয়নচারা' দুর্ভিক্ষপীড়িত ব াংলার যে-কোনো একটি গ্রামের নাম নয় মাত্র; মুয়ুরাক্ষী নদীর তীরের ঐ জনপদ থেকে যেসব ক্ষুধার্ত মানুষ দু'মুঠো ভ াতের আশায় কলকাতা মহানগরে লঙরখানা খুঁজতে এসেছে -- তাদের কাছে বাস্তব তো ধোঁয়াটে অনুষঙ্গ শুধু। ওরা বঁ াচে বিলীয়মান স্মৃতির অবশেষ নিয়ে। আশ্রয়ের নাম হয়ে ওঠে নয়নচারা, কেন না সেই তো আমু -র মতো ছিন্নমূল স্মৃতিজীবী মানুষের পক্ষে বহু প্রজন্মের ভরসা ও নীড়ের সংকেত। অতএব এই গল্পের পাঠকৃতিতে ভাষা বহুস্বরিক, বাস্তব ও অধিবাস্তবের গ্রন্থনা তাতে খুব স্বাভাবিক। চেতনা - প্রবাহের বিচ্ছুরণ উপস্থাপিত করাই লিখনশৈলীর অন্বিষ্ট, এরকম মনে হয়। কেন না বারবার অবচেতন নির্ভর প্রতীকিতার বিন্যাসে কাহিনি - অতিযায়ী পরাপাঠ বেশি গুত্ব অর্জন করে নেয়।

'ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে' ---এ জাতীয় অভিব্যক্তি গল্পকারের বাচনভঙ্গি নয় কেবল , মনোভঙ্গিরও বিশিষ্টতা নির্দেশ করে। লঙ্গরখানায় খাওয়ার পরে প্রেতায়িত মানুষেরা ফুটপাতে এলিয়ে পড়ে থাকে--- 'ছড়ানো খড় যেন। 'ইশারাময় এই বাচন অসহায়তা ও রিক্ততার অপূর্ব চিহায়ক। চারিদিকে যখন 'মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম' এর সর্বগ্রাসী ছবি, আমুর চোখে ঘুম থাকে না। তার মন জেগে থাকে নয়নচারা ও ময়ুরাক্ষীর ধারে কাছে। নিষ্ঠুর প্রাণহীন মহ ানগরের ফুটপাতে শুয়ে চেতনা - প্রবাহে ভাসমান সত্তা ফিরে যায় গ্রামীণ উৎসে। জেগে জেগে 'ঢালা মাঠ, ভাঙা মাঠ, ঘ াস, শস্য আর 'ময়ূরাক্ষী'র স্বপ্ন দেখে সে, শূন্যতা ও রিক্ততার আদ্যন্তহীন সন্ত্রাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমুর মতো ছিন্নমূল ভাঙা মানুষেরা স্মৃতি মন্থনকেই করে তোলে তাদের প্রতিরক্ষার কৃৎকৌশল। এই বয়ানে কোনও প্রথাগত গল্প নেই, আছে শুধু আমুকে উপলক্ষ করে নিয়ামক কথকসত্তার সর্বত্রগামী উপস্থিতি। আছে চেতনার মুক্ত সঞ্চরণ। সাম্প্রতিক আকরণোত্তরবাদী পাঠকৃতিতে চেতনায় পরিস্রুত বাচনের প্রায় অন্তহীন বিচ্ছুরণের কথা শুনি। ওয়ালীউল্লাহ্ এই তত্ত্বভাবন

ার প্রায় তিন দশক আগে কার্যত একই বাক্ - প্রকরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন।
ক্ষুৎপীড়িত আমুর পেছনে কথকসত্তার ছায়া যদিও স্পষ্ট, তবু সংকেত হিসেবে তার বিশিষ্ট উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে অনেকান্তিক চেনা ও অবচেতনা, বাস্তব ও পরাবাস্তবের সংশ্লেষণ এমনভাবে সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পে প্রায় ঘটেনি বলা চলে। আমুর আর্তি--- 'কোথায় গো, কোথায় তোর নয়নচারা গাঁ' সংবেদনশীল পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। শুধু তাই নয়, বয়ানের প্রকট বৌদ্ধিকতার মধ্যে এ ধরনের আর্তি আবেগের সজল মেঘ সঞ্চার করে একদিকে উপস্থাপনার রৈখিকতা ভেঙে দেয় এবং অন্যদিকে মানবিক উত্তাপও বজায় রাখে। কেন না শেষ পর্যন্ত মানবিকতার নির্যাস খুঁজে পাওয়াই গল্পকারের অন্বিষ্ট। মহানগরকে আমুর মতো মানুষেরা কোন চোখে দেখে, তাও চিহ্নায়িত বাচনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো, আর দেহের সাথে জমির কোনও যোগাযোগ নেই, যে - হাওয়ায় তারা চঞ্চল -- কম্পমান, সে হাওয়াও দিগন্ত থেকে উঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো শুষ্ক অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়; এ হাওয়াকে সে চেনে না। অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নীচে, কোমল ঘাস নেই।' অনুভবের এই গ্রন্থনা থেকে যে - বার্তা উঠে আসে, তা হল, আমুর মতো মৃত্যুতাড়িত মানুষেরা শুধু বিলীয়মান বৃদ্ধদের সংখ্যা নয়। তাদের নিশ্চিহ্নায়িত ও ধ্বংসোন্মুখ অপর পরিসরেরও রয়েছে নিজস্ব চেতনার গ্রন্থনা - যুক্ত বয়ান।
সর্বগ্রাসী বিয়োগপর্বেও ওরা সংযোগের সম্ভাব্য প্রকরণ খোঁজে এবং খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চায় নিজেদের প্রাক্তন জীবনের স্মৃতিকে যখন ওরা পোকামাকড়ের মতো ছিল না, তাদেরও ছিল মানুষের পরিসর। নিষ্প্রাণ ইট - কাঠ পাথরের মহানগরে তাদের মৃত্যুও কোথাও কোনও দাগ কাটে না। গল্পকার ওয়ালীউল্লাহ্ আমু ও ভুতনির মতো চূর্ণ - মানুষদের রেখায়িত উপস্থিতি থেকে নিঙড়ে নিয়েছেন আস্তিত্বিক সত্যের বিপ্রতীপতা। মন্বন্তর নিয়ে অনেকেই লিখেছেন; কিন্তু জুলন্ত ক্ষুধার এমন নির্মম ও ভাবালুতা - শূন্য উপস্থাপনা দুর্লভ। বিলীয়মান পরিসরের প্রান্ত থেকে নাগরিক বাস্তবতাকে কীভাবে মনে হয় 'অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত ... নেই অথচকেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে' --- তার সূক্ষ্ম উপস্থাপনাতেই গল্পত্ব খুঁজব। যে - মানুষেরা রয়েছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, তাদেরই চোখেধরা পড়ে 'আলোরেখা গতিদ্ধ স্তব্ধতা।' যার ক্ষুধার্ত, মহানগরের আধিবাসীদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখতে দেখতে ওরা বুঝে নেয়, বিচিত্র কূটাভাসে জনারণ্যে মানুষ নেই 'দোলায়িত এ কালো রঙের সাগর'। আর, ক্ষুধারও আছে নিজস্ব বিভ্রম 'ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাঁড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যে হলুদ - রঙা স্বপ্ন ঝুলছে।'

।।চার ।।
ওয়ালীউল্লাহের বয়ানে রৈখিকতা জমাট বাঁধতে পারে না যেহেতু বাস্তব ও অধিবাস্তবের স্বতঃসিদ্ধ দ্বিরালাপ প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভাষার উদ্বৃত্ত সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। ভাষার উদ্বৃত্ত মানে অস্তিত্বেরও উদ্বৃত্ত সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করে তোলে।ভাষার উদ্বৃত্ত মানে অস্তিত্বেরও উদ্বৃত্ত। নইলে আমুর মতো বিলীয়মান মানুষের মধ্যে গল্পকার দেখতে পেতেন না 'একটা বিদ্রোহ -- একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁ ধাঁ করে জ্বলে উঠল সারা দেহময়'। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ছাড়া অন্য সব কিছু যখন অবান্তর --- ' বহু অচেনা পথে ঘুরে - ওরে আমু জানালে যে ও - পথগুলো পরের জন্যে, তার জন্যে নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে। কোন - সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ - উদগ্র ব্যস্ততা? সে - গুহা কি ক্ষুধার!' এবং সে - গুহায়কি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে - গুহা?'
অনবদ্য এই বাচন যেখানে লক্ষ করি মন্বন্তরের হিংস্র বাস্তব লিখনকে কী তীব্র শারীরিক অনুষঙ্গে স্পন্দমান করে তুলছে। এই লেখা অস্তিত্বের বিবরণ মাত্র নয়, এ হল অস্তিত্বের নাট্যক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ায় অভিব্যক্তি। লেখার গভীরতর ও অজ্ঞাতপূর্ব তাৎপর্য আবিষ্কার করার এই প্রকরণ ওয়ালীউল্লাহ্কে যে আন্তর্জাতিক সাহিত্যবিশ্বের নাগরিক করে তুলছে--- সেদিন অনেকেই তা অনুধাবন করেননি। সময়ের নিবিড়তর উপস্থিতি পাঠকৃতির কোষে- কোষে অনুভব করি আমরা আর স্মরণ করি মরিশ ব্লাশোঁর অসামান্য উক্তি "Writing changes us, we do not write according to who we are; we are according to what we write!" অর্থাৎ আকরণোত্তর লেখার তীব্র অভিঘাত লেখকের যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে পেরিয়ে যায়। মন্বন্তরের জান্তব বাস্তবের উন্মোচনে একদিকেবাস্তবের ভেতরকার চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে প

াঠকৃতির সূত্রধারের সময়ানুশীলন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নিয়ে এসেছে গল্পবিশ্ব ও গল্পবীক্ষার আমূল রূপান্তরের বার্তা। এবং, গল্পকার - সত্তারও। 'নয়নচারা' পড়তে - পড়তে মনে হয়, কোনো বিশেষ ব্যক্তি - পরিসরের কথকতা নয় -- সময়ের কৃষ্ণবিবরই এই পাঠকৃতির আধার এবং আধেয়। বাংলার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যুমুখী মিছিলে কোথাও কি প্র াসঙ্গিক রয়েছে মানবিক পরিসরের বোধ -- এই জিজ্ঞাসা ঠিকমতো তুলে ধরার জন্যে রচিত হয়েছে 'নয়নচারা', কল্পিত মীমাংসায় পৌঁছানোর জন্যে নয়। ক্ষুধা মানুষকে শরীর-সর্বস্ব করে তোলে মানবিক বৃত্তির অবলুপ্তি ঘটে অবধারিত ভাবে। নিজস্ব গল্পভাষায় বয়ানের এই পরাপাঠ ব্যক্ত করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্ 'এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেই - ই, তার দেশের যারা বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গাঙানো পেট তাদের হাঁ করে রয়েছে।' কিংবা 'সে কে মেরেছে বা কে মরছে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরেছে কথা দু- রঙা দানায় গাঁথা মালা।'

সর্বগ্রাসী ক্ষুধাই আমুর অন্তরে একটা অচেনা মনকে জাগিয়ে দেয় 'মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ' সত্তাকে মথিতকরে। বাস্তব মুছে যায় ধোঁয়ার মতো পরাবাস্তব পরিসরের প্রাবল্যে সব বস্তুসম্বন্ধ ধবস্ত হয়ে যৌক্তিক বিন্যাস হারিয়ে যায়। লিখনে সাবলীলভাবে প্রথম পুষের সর্বনাম ও ক্রিয়া উত্তম পুষে রূপান্তরিত হয় 'সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটব, চেটে চেটে, তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাব সে - আকাশ দিয়ে।' চারদিকে যখন উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে মানুষ কুকুরের স্তরে নেমে যাচ্ছে,জীবন ও মৃত্যুর চৌকাঠে - দাঁড়ানো 'অমু মানুষ ভেতরে - বাইরে মানুষ' হয়ে থ াকতে চায়। কিন্তু অন্নভোজী ও নিরন্ন মানুষদের মধ্যে যেনতুন বিভাজন ঘটে গেছে, তাতে আমুকে মানুষের মর্যাদা দেয় না কেউ। শহরের লোকেরা আসলে অন্ধ, ওরা নকল চোখে মানুষ দেখতে পায় না; তাই ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়ালে আমুকে কুকুর - তাড়া করে। মানবিকতার বোধ থেকে বিচ্যুত নাগরিক জনেরা প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ওরা নকল চোখে মানুষ দেখতে পায় না; তাই ময়বার দোকানের সামনে দাঁড়ানো আমুকে কুকুর - তাড়া করে। মানবিকতার বোধ থেকে বিচ্যুত ন াগরিক জনেরা প্রকৃতপক্ষে অন্ধ এই পরাপাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয়ে হোসে সারামাগো প্রণীত 'Blindness' নামক রূপক উপন্যাসের কথা। বয়ানের উপসংহারে পেয়েছি বহুস্বরিক এই বাচন 'I think we are blind, Blind but seeing, Blind people who can see, but do not see.' (পৃ. ৩০৯)। হোটেলে যারা চর্ব্যচুষ্য খায়, তাদের রসন ালোভন খাবারের গন্ধ আমুর মতো বুভুক্ষুকে মরিয়া করে তোলে। পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রমাণ করেছিল, সভ্যতার সহগামী হল বর্বরতা; সমৃদ্ধির সহযাত্রী চূড়ান্ত অসারতা। বিশেষত এই গল্পের কোথাও ছোঁয়া লেগেছে অ্যাবসার্ডের। নইলে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর 'অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায়' পৌঁছাত না আমু। পারাপারহীন ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে পালিয়ে যেতে হয় সেই রাস্তা দিয়েই যে - রাস্তার কোনো শেষ নেই।

গল্পহীন গল্পের বয়ান শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায় যখন স্বচ্ছলভাবে ক্ষুধার জান্তব প্রকাশ ঘটে আর্তনাদে। 'মাগো, চাট্টি খেতে দ াও'। যেন আমুর ভেতরকার মানুষ হঠাৎ চমকে উঠে তার জান্তব হাহাকার শুনতে পায়। এই আরোহী - মুহূর্তের বিবরণে ওয়ালিউল্লাহ্ দক্ষতার তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছেন ''অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হল যে একটা বদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে - বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে আর্তনাদ শূন্যতায় মুক্তি পেল, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাল তা। এ কি তার গলা - তার অ ার্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানো কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে ? তবু, তবু, তার মনে প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল আপদমস্তক।' এমন উপস্থাপনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। বাচনাতীত যন্ত্রণা মনের পরিধি থেকে যখন শরীরে সংক্রামিত হয়ে বিষক্রিয়ার মতো অঙ্গে - প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, চিত্রকলার অভিব্যক্তিবাদী প্রবণতা ভাষারূপে সঞ্চারিত হয়। ওয়ালীউল্লাহের উপস্থাপনা যেন মনে করিয়ে দেয়ে অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকর এডওয়ার্ড মাঙ্কের বিখ্যাত ছবি 'চিৎকার' (দি ক্রাই ১৯৯৩) এর কথা।

কিন্তু এখানেই ছোটগল্পের বয়ান সমাপ্ত হয় না। মানবিকতার ছোঁয়ায় শরীর - নিঙড়ানো ক্ষুধার রৈখিক প্রকাশ পেছনে সরে যায়। বন্ধ দরজা খুলে, জীবনের দ্বিবাচনিকতার প্রতিভূ হয়ে, একটি মেয়ে অতি আস্তে- আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বলে 'নাও' এবং আমুর ময়লা কাপড়ের অঞ্জলিতে একটু ভাত ঢেলে দেয়ে। উন্মাদতুল্য আর্তনাদের বিপ্রতীপে 'অতি আস্তে - আস্তে অতি শান্ত গলায় বলা 'ভাষায় ছবির দ্যোতনা জাগিয়ে তোলে। এবার পাঠকৃতি ফিরে আসে মানুষের সম্ভাব্য

জগতে, নাগরিক মভূমির উল্টোদিকে স্মৃতিময় সজল মেঘের মতো নয়নচারা গ্রামের প্রতীকায়িত পরিসরে। আমুও ফিরে প ায় মানুষের ভাষা কেন না মানবিকতার ছোঁয়া পেয়েছে সে। অন্নদাত্রীকে মনে হয় নয়নচারা গ্রামের অধিবাসিনী কেন না এছাড়া কণা নেই কোথাও। বিস্মিত মেয়েটি যে উত্তর না - দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, অমোঘ এই বাস্তবে পাঠকৃতিকে ফিরে আসতেই হয়। কিন্তু ধাপে - ধাপে মৃত্যু - শাসিত প্রান্তিক জীবনের নির্মিতি থেকে যে - নির্যাস আহরণ করেছেন ওয় ালীউল্লাহ্, তার আবেদন ব্যর্থ হয় না। তাঁর গল্পভুবনে তো নিশ্চয়ই, বাংলা ছোটগল্পের বিপুল জগতেও 'নয়নচারা'র মতে া সার্থক ও ব্যতিত্রমী রচনা দুর্লভ। নিছক সময় - যাপন নয়, সময় - পরিশীলন গল্পকারের অন্বিষ্ট, এই বার্তা পাঠকের ক াছে পৌঁছে দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্।

।। পাঁচ।।

'মৃত্যুযাত্রা' করাল মন্বন্তরের আরো একটি নিষ্ক্রণ পাঠকৃতি। এমনও বলা যায়, 'নয়নচারা'র সম্ভাব্য প্রাক্সন্দর্ভ হিসেবে একে গণ্য করা চলে। অর্থাৎ 'মৃত্যুযাত্রা'য় ক্ষুধা - তাড়িত গ্রামীণ মানুষের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রত্রিয়ায় একটি পর্ব শেষ হচ্ছে; আর এক অনিবার্য পরিণতি দেখতে পাচ্ছি' নয়নচারা'য়। এই দুটি পাঠকৃতি যেন কৃষ্ণবিবরের আগ্রাসনের অন্যে ান্যসম্পৃক্ত পর্যায়। বহিমান সময়ের আখ্যান দুটিতে পিণ্ডাকৃতি মানুষ খড়কুটোর মতো ইন্ধন। ব্যক্তির সংরূপ গুত্বহীন বলে সামগ্রিক বাচনের অভিব্যক্তি গল্পত্বের আশ্রয়; সময়ই মূল কুশীলব বলে গল্পকার যাবতীয় অনুপুঙ্খ - বিন্যাসের পরাপাঠের প্রতি ইশারা করেছেন শুধু। গ্রাম - ছাড়া কোনো রাঙা মাটির পথ নয়, ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী ক্ষুধা ছিন্নমূল করেছে যাদের -- সেইসব মানুষের অপভ্রংশেরা আদিম যাযাবরদের মতো স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ভেসে বেড়ায়। 'অন্ধকারে সেখানে দৃষ্টি চলে না, শুধু রাতের স্তব্ধতায়' তাদের চিহায়িত উপস্থিতি প্রতিবেদনের উপজীব্য। আদি - মধ্য - অন্তের প্রচলিত অর্থ তাতে অবান্তর এবং কাহিনি অপ্রাসঙ্গিক। অতএব এলিয়ট কথিত 'gesture without motion' এর দৃষ্টান্ত হয়ে প্রারম্ভিক বাক্যে গতিহীন অস্তিত্বের দ্যোতনা বিচ্ছুরিত হয় 'অন্ধকার নিবিড় হলেও তবু আবছা - আবছা - নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছই শূন্য ভারি খেয়া নৌকাটা। তারপর দেখি একদল মেয়ে - পুষ জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে নিশ্চল ভাবে। ... বসে থেকে - থেকে কালো চোখ ভরে উঠেছে ঘুমে, কারো চোখ অবসাদে বোজা, আর যাদের চোখ খোলা - রাতের অন্ধকারে তাদের সে - চোখের পানে তাকালে মনে হবে, মৃত্যু যেন তাকিয়ে রয়েছে কালো জীবনের পানে।'

মৃত্যু - শাসিত ক্ষুৎপীড়িত জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দুরাশায় যারা সামাজিক অস্তিত্বের শিকড় ছিঁড়ে পথে বেরিয়েছে, ওরা মনে - মনে অনুভব করে, সমস্ত পথের শেষে কিংবা পথের পাশে ওঁৎ পেতে আছে মৃত্যু। 'যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)। নিস্তব্ধতা ও নিরাশার চিহায়ক পুনরাবৃত্ত হয়ে তাই পাঠকৃতির শুতেই মেজাজের লয় - তাল - সুর বেঁধে দেয়। তাই তিনুর চোখে ধরা পড়ে, ঘাটে বাঁধা নৌকোয় নিরাশা থমকে আছে এবং ওপারেও 'পথশূন্য নিরাশার কালো ঘন বিস্তৃতি'। ক্ষুধা যখন একমাত্র প্রাসঙ্গিক তথ্য, সমস্ত অনুপুঙ্খ মৃত্যু - গ্রথিত হয়ে যায় এইজন্যে নৌকোর দিকে তাকিয়ে নিতনুর মনে হয় 'ঘাটের কিনারে দেহ ছেড়ে এসে নৌকার প্রাণ ঘুমোচ্ছে ওই গহ্বরে-- ওই অন্ধকারে।' এতে সন্দেহ নেই যে 'মৃত্যুযাত্রা'র বয়ান জুড়ে পরাপাঠের বিচ্ছুরনই আসল কথা; ক্ষুৎ?কাতর মানুষের জান্তব অস্তিত্ব মৃত্যুর নিরাবেগ দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে বারবার। তবে এর ফলে কথকস্বরের তর্কাতীত প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন তিনু স্পষ্টত কথকস্বরের প্রতিনিধি 'তার আশঙ্কা হচ্ছে--- মহাসাগরের তীরে যেন বসে রয়েছে। পথ ভুল করে কি তারা সীমাহীন মহাসাগরের তীরে এসে বসেছে মরণের পারে যাবে পরে?'

মতি নাপিতের বউ গ্ন কমলির গোঙানি শুনতে শুনতে নিস্পন্দ রাত্রিতে তিনুর যে অনুভব হয়, তাতে তার কাঙ্ক্ষিত বাস্তবত া ঝাপ্সা হয়ে গেছে। কথকস্বর আসলে বাচনের অতিরেকে অস্তিত্বের উদ্বৃত্ত স্তরের আভাস দিতে চায়। বাস্তব যখন রিক্ত ও বিনাশক, প্রকল্পনার মধ্যে সম্ভাব্য মুক্তির দিশা খোঁজে 'যেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নদী পালিয়ে যাচ্ছে--- তাদের ব্যথা তার শুষ্ক তীরে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে সেই দেশে -- যে দেশে নদী চওড়া হয়ে দু'তীরের মাঠভরা দিগন্তবিস্তৃত ফলন্ত ফসল ছোঁয় - ছোঁয় করে নিবিড় আদে। নদীর ওপর নীল আকাশ আর সোনালি সূর্য ঝক্ঝক্ করে তার টলমল জলে নানা রঙের পাল উড়িয়ে বড়বড় ধানের নৌকা ভাসে, আর পশ্চিমা মাঝিরা ঝিমোয়--- শুধু ঝিমোয় পরম সুখে।' এভাবে ওয়ালীউল্লাহের গল্পবীক্ষায় দ্বিবাচনিকতা কেন্দ্রীয় গুত্ব অর্জন করে। একদিকে পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ আর

মৃত্যুর চলচ্ছবি, অন্যদিকে সুখ ও পূর্ণতার চিহ্নায়িত বাচনে উদ্ধৃত্ত অস্তিত্বের ইশারা। লক্ষণীয় যে সমান্তরাল অপরতার প্রতি তর্জনি সংকেত করেও অবধারিতভাবে বয়ান ফিরে আসে অমোঘ বাস্তবে 'কিন্তু এখানে অন্ধকার, মরা নদীর খোলস, আর স্তব্ধতা।' এই ফিরে আসতেই গল্পত্বের প্রতিষ্ঠা। কীভাবে ছোটগল্পের পাঠকৃতি গড়ে তুলতে হয়, এ যেন তারই প্রয়োগিক প্রদর্শন। মন্বন্তর মুছে দেয় সব কিছু -- ব্যক্তিত্ব, স্বপ্ন, স্মৃতি। 'শুধু যে তাদের গাঁয়ে নয়, সর্বত্র আকাল ও অনটনলেগেছে' --- এই নিয়ামক তথ্য তিনু, করিম, আসগর, ময়না সবাইকে পাল্‌টে দিয়েছে। বুভুক্ষু মানুষের কোনো স্বপ্ন নেই, প্রীতি নেই, আলো নেই। নিষ্প্রদীপ পরিবেশ আর মনের অন্ধকার একাকার হয়ে গেছে। হাজুর বাপ ও মা নামে দুটি অতি বুড়ো বুড়ি ছিল ঐ মৃত্যুযাত্রায়। তারা পথের মরেছে; কিন্তু অবশিষ্ট জীবিত জনদের তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। ভাত খাওয়ার কল্পনা করে ওরা মরিয়া হয়ে বেঁচে থাকতে চায় শুধু। 'অতি ক্ষীণ হালকা দূর পথের আলো' --- এই চিহ্নায়ক তাদের প্রব্রজন অব্যাহত রাখে।

কথকস্বর বয়ানের রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে দার্শনিক বাচনের সূত্রে সরাসরি পাঠকদের সম্বোধন করেছে 'মৃত্যু - যাত্রা শু হয়েছে। তাদের সে - যাত্রা আশায় দোলায়িত। অথচ নিরাশায় জর্জরিত। চলার পথ ধূলিধূসর, নিষ্ঠুরতায় ক্ষ আর যেন অন্তহীন, প্রতিটি মূহূর্ত বেরিয়ে আসছে অজানার কালো গহ্বর হতে, এবং বেরিয়ে আসছে একঘেয়ে বৈরিতায়। তবু নিঃশব্দ পথগুলো নীরবে চলছেধবংসের পানে। এই মৃত্যু - মিছিল থেকে যারা ঝরে যায় তাদের জন্যে কোনো খাঁটি বিষণ্ণতা অনুভব করে না সহযাত্রীরা। আগ্রাসী ক্ষুধামানুষকে মানবিকতা থেকে বিচ্যুত করে জান্তব স্তরে নামিয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতেও অসাধারণ সূক্ষ্মবোধ চিহ্নায়ক ব্যবহারের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। বুড়িকে কবর দেওয়ার জন্যে তিনু ও করিম যখন মাটি খুঁড়ছে, গল্পকার লেখেন 'হাত ভরা মাটি -- হাত ভরা ভাতেরমতো মটি, অথচ ভাত নয়'। এই বিভ্রমে করিমের 'চোখে লালাঝরা লোলুপতা জাগে। এর উল্টো দিকে লকলকে সাঁকো বেয়ে - আসে মেয়েটির বর্ণনাও তাৎপর্যপূর্ণ 'পেট ভরে প্রচুর - প্রচুর খেয়ে এসেছে কিনা, তাই ঝলমল করছে তার সারা দেহ.....'। কিংবা অনু সম্পর্কে কথকের মন্তব্য সারা গাঁয়ে কত লোক না - খেতে পেয়ে মারা গেছে, তার হিসেব আনু রাখতে পারে না --- 'আনুর হিসাবের বুদ্ধি নেই। যার পেটে যত ভাত তার পেটে তত হিসাবের বুদ্ধি ....'।

তিনু ও করিম কোদাল খুঁজতে গ্রামের দিকে যায়। ফিরেও আসে খালি হাতে। কিন্তু ওদের এই যাওয়া অভুক্ত লোকগুলির মনে কিছু একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয়। ফলে গভীর হতাশায় তোতা তিনুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অচিরেই হাতাহাতি থেমেও যায় মৃত সহযাত্রীর জন্যে সমবেদনার কোনো কম্পন নয়, বুভুক্ষু লোকগুলো ভাবে, গ্রামে গেলে হয়তো খাবার মিলবে কল্পিত খাদ্যে রসালো হয়ে ওদের জিহ্বা। কথকস্বর জানায় 'ওধারে উলঙ্গ প্রান্তর ধু - ধু করছে খররোদে, আর এধারে এদের মনের বিষ, বৈরিতা। জীবন কি জীবন্ত - কবর, জীবন কি এতই ভয়াবহ?'

এসময় গ্রাম থেকে কয়েকজন উৎসাহী তণ কাফন ও মুর্দার খাট নিয়ে আসে, বুড়ির মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে দাফন করার জন্যে। বুভুক্ষুরা ওদের কাছে খাদ্যের আশা করেছিল; কিন্তু জীবিতের সেবায় ওদের তেমন আগ্রহ নেই। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করে যারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা শহিদ - এধরনের বাক্‌চাতুর্য ক্ষুধা দূর করতে পারে না। ওয়ালীউল্লাহ্ এভাবে আসলে সমাজ - সংস্থার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। দু'একজন পুষ ছাড়া তিনুরা সবাই শবানুগমন করে আবার গ্রামে যায়। ফিরে এসে তিনু গ্রামের কোনো এক চৌধুরী সাহেবের কথা বলে! শোনা গেছে, কাকুতি - মিনতি করলে ঐ ব্যক্তি দু'মুটো খেতে দিতে পারে। অতএবং গোটা দলের মধ্যে গ্রামে অভিযানের জন্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। গল্পকারের উপস্থাপনায় যাতায়াত ও চিহ্নায়িত হয়ে গেছে; মৃত্যুর অবলুপ্তি থেকে আরো একটু বেঁচে থাকার রসদ খোঁজার দিকে বুভুক্ষুর অন্তহীন মিছিল কণায়, বেদনায় অব্যাহত থাকে। আশা যখন নির্ভুল সত্য হিসেবে গৃহীতহচ্ছে, তখনই ওরা আবিষ্কার করে, বুড়োও মারা গেছে। কিন্তু বুড়ির দাফনের জন্যে যারা অপেক্ষা করেছিল, তাদের মধ্যে এখন আর প্রতীক্ষা অবশিষ্ট নেই।

কয়েক ঘন্টা ক্ষুধার যন্ত্রণা সইতে - সইতে ওরা যে জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে আরো একটু এগিয়ে গেছে, এই বোধ তাদের অধৈর্য করে তোলে। বেঁচে থাকার সাধনই সবচেয়ে বড়ো বাস্তব, ওয়ালীউল্লাহ্ এই সংকেত দিয়েছেন আমাদের এই প্রসঙ্গে হালুর মার কথায় সেবা ত্রিয়াপদটিও অন্তর্বৃত ল্বযে উতরোল হয়ে উঠেছে। বুভুক্ষুদের দল কলরব চরমে তুলে যখন গ্রামের দিকে যায়, কোনও নিশ্চিত সমাপ্তির দিকে যায় না তাদের চলা। আসলে ওরা শূন্য থেকে শূন্যে মিলিয়ে যায় কেন না এই হল মন্বন্তরের সময় - চিহ্নিত কথকতা। সুতরাং রিক্ততা ও অবসানের চিহ্নায়িত বাচনে পাঠকৃতিও পৌঁছায় সমাপ্তি -

বিন্দুতে 'তারপর সন্ধে - হাওয়া থামল, ক্রমে ক্রমেরাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো।'

।। ছয় ।।

এই যে চমৎকার শব্দবন্ধ ---'অনন্ত তমিস্রার দার্শনিক' ---তা ওয়ালীউল্লাহের গল্পবীক্ষায় সময়বোধের প্রবল উপস্থিতির স্মারক। বিখ্যাত চিত্রকর জয়নুল আবেদিনের মতো তিনিও যেন করাল মন্বন্তরের অবিনাশী রেখাচিত্র এঁকে গেছেন। সেইসঙ্গে স্পেনের বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ মিগুয়েল উনামুনোর প্রসিদ্ধ রচনা 'Tragic sense of life' এর গভীর প্রভাসে বাংলার সাধারণ জীবনপ্রবাহ থেকে আবহণ করে নিয়েছেন বেদনা ও সৌন্দর্যের কিছু কিছু ছায়াচ্ছন্ন মুহূর্ত। উনামুনো যেন প্রাছলে মীমাংসা দিয়েছেন 'Why not an eternity of suffering? Hell is an externalization of the soul, even though it is an eternity of pain. Is not pain essential to life?' (১৯৫৪ - ২৪৭) প্রাগুক্ত গল্প দু'টি ছাড়া 'খুনী'র কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। গভীর ট্র্যাজিক সংবিদ বয়ানের নিয়ামক বলেই তা অপরাধকাহিনি হয়নি, সার্থক ছোটগল্প হয়েছে। যা হতে পারত বহির্জগতের কাহিনি তা হয়ে উঠেছে অন্তর্ভুবনের কথকতা। আকস্মিক উত্তেজনায় চর অলেকজান্দ্রার সোনা - ভাঙা গ্রামের মৌলবীর ছেলে রাজ্জাক খুন করে প্রতিবেশী ফজু মিঞার ছেলেকে। তারপর নিদ্দেশ হয়ে যায় । গল্পকারের বর্ণনায় নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ বয়ানের শুতেই পথভ্রান্তির চিহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'উদ্দাম হাওয়ায় সে প্রান্তরময় ধুলো উড়ছে। ... আর যে পথটা গ্রাম থেকে বেরিয়ে কিছু এঁকে বেঁকে সোজা পশ্চিমে চলে গেছে, সে - পথ স্থানে স্থানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে ধুলোর মধ্যে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে উদ্দাম হাওয়ার তীব্র মায়ায়।' বয়ানের শেষে দেখব, রাজ্জাকও পথ - বিভ্রমের শিকার - শূন্যে মিলিয়ে গেছে তার আকাঙক্ষা। দক্ষিণবঙ্গের চর অঞ্চল থেকে সে চলে এসেছিল উত্তরবঙ্গের কোনো - এর মহকুমা শহরে। সেখানে দর্জি আবেদ মিঞার কাছে নিজের সত্য পরিচয় দিয়েও আশ্রয় মেলে তার। নির্জনতার নীরবতা যেখানে অত্যন্ত জমাট, সেই ছোট্ট জনপদে বৃদ্ধ দর্জির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মানবিকতার উত্তাপ --- 'যার কাছে মনের বোঝা নামিয়ে হালকা হতে পারে, তারপর বাঁচতে পারে মনের সে দুরারোগ্য ক্ষত থেকে, যে ক্ষত তাকে দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর স্থান হতে স্থানান্তরে কেবল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।' দর্জি তাকে নতুন নাম দেয় মোমেন। এক যুগ আগে হারিয়ে - যাওয়া ছেলের নামে পরিচিত হয়ে রাজ্জাক যেন নতুন মানুষহয়ে ওঠে। গল্পকার দেখিয়েছেন, অস্তিত্বের অন্তর্বর্তী শূন্যতা তবুও অনতিত্রম্য। এই শূন্যতার প্রভাবে কাঠ হয়ে - ওঠা শক্ত দেহ হতে মনহঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শূন্যতায় ভেসে গেল শূন্য হয়ে যে শূন্যতায় কোনও কথা নেই, তার ক্ষত বিক্ষত অন্তরের ছবি গল্পকার 'বালুর চর' -এর মতো চিহায়ক বারবার ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন। তার প্রবল নিঃসঙ্গতা বোধেও জরিনা বিবির মানবিক স্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা হয়ে আসে। তার মনে কালবৈশাখীর মতো উদ্দাম ঝড় দেখা দেয়। গল্পকার প্রাকৃতিক অনুপুঙ্খকে চিহায়িত বাচনে রূপান্তরিত করেছেন। বালুরচর, বালির বাঁধ ইত্যাদির প্রয়োগ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নিস্তব্ধতার মধ্যে রাজ্জাকের মন যেন বেদনার্ত প্রশ্নদোলায়িত হয় তা প্রমাণ করে, শেষ পর্যন্ত মানুষ নিয়েই যত কথকতা। পাঠকৃতিতে হঠাৎ -ই মোচড় তৈরি হয় বহু বছর পরে আসল মোমেনের আবির্ভাবে। রাজ্জাক বুঝে নেয়, তার অভিনয়ের পালা শেষ হল ---'এবং এ বাড়িতে যেন সে খড় - ভরা বাছুরের মতো ছিল'। ট্র্যাজিক সংবেদনার নিরিখে সে হয়ে ওঠে গ্রিক পুরাণের ট্যান্টেলাস যার ওষ্ঠজল ছোঁয় না কখনও 'নীল পানি সে শুধু কল্পনাই করতে পারবে, বাস্তবে তার সন্ধান পাবে না।'

গল্পকার তাই 'খুনি'র বয়ানে অপরাধতত্ত্ব অনুশীলন করেননি। মানুষের আস্তিত্বিক বোধ তাঁর অন্বিষ্ট। রাজ্জাক নিম্নবর্গীয় কিন্তু তার কোনো দীনতা বা সীমাবদ্ধতা নেই। নইলে 'হঠাৎ - ঘটিত সব শূন্যতার বেদনা' তাকে আক্রমণ করত না বা জীবন সম্পর্কিত প্রশ্ন তাকে সারা সন্ধ্যা ভাবাত না। উজ্জ্বল সূর্যালোকে মোমেনের সঙ্গে তার দেখা হয় যখন, নিজের খুনি পরিচয় প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা হয় না রাজ্জাকের। মোমেন যখন হইচই বাধিয়ে তোলে, চিরদিনের মতো রাজ্জাক এতদিনকার আশ্রয় ছেড়ে চলে আসে। জরিনা বিবির বিস্মিত দৃষ্টি তাকে পরবর্তী কালে উদ্বেল করবে কিনা, তা অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য হল এই, শূন্যতা থেকে শূন্যতায়প্রত্যাবর্তন। সত্তাকে ঘিরে রাখে শূন্যের পরিধি, এই ইশারা অকরণোত্তর বার্তা হয়ে জেগে থাকে।

সার্থক গল্পকারের অভিজ্ঞান হল জীবনের বিচিত্র পরিসর উন্মোচনের ক্ষমতা। প্রকৃতি আজও দুরধিগম্য বিস্ময়, কিন্তু ম
ানুষের চেয়ে বেশি বিস্ময়কর কিছু নেই। 'জাহাজী' ও 'পরাজয়' তারই দৃষ্টান্ত যেন। জাহাজে যাদের জীবন কাটে,...বৃদ্ধ
করিম সারেং তাদের প্রতিনিধি, কর্মজীবনের অবসানবেলা ঘনিয়ে এসেছে বলে বেদনা ও অবসাদের অনুভবে জেগে ওঠে,
অর্থহীন শূন্যতা বোধ 'অতিক্রান্ত দীর্ঘ জীবন অদ্ভুতভাবে শূন্য ও ব্যর্থ ঠেকেছে কঙ্কালের চোখের মতো।' ওয়ালীউল্লাহ্ এভ
াবে আস্তিত্বিক শূন্যতার ক্ষেত্রে কর্ষণ করেন। তবু গল্পকারের চোখে তিনি দেখতে পান করিম সারেঙ্গের অনভিব্যক্ত পিতৃত্ব,
বালক ছায়াত্তের কান্নায় যা জেগে ওঠে। পাঠক হিসেবেআমরা লক্ষ করি বয়ানের অত্বরিত গ্রন্থনা, আশা - আকাঙক্ষ
াশূন্য শান্ততার বিপ্রতীপে তাণ্যের চাঞ্চল্য এবং অভিজ্ঞতা - লব্ধ প্রজ্ঞার, বলা ভালো 'শূন্যতার অনন্তের উল্টোদিকে সংস
ারের তীব্র আকর্ষণ। তাই ছাত্তারের সাংসারিক অনুপুঙ্খের কথা 'সারেঙ্গ ক্ষুধার্তের মতো গোগ্রাসে শুনল। তারপর আব
ার আশর্চ্যভাবে স্তব্ধ হয়ে রইল।' এ হল সার্থক ছোটগল্পের উপযোগী সংকেতের ভাষা।
ওয়ালীউল্লাহের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন অস্তিত্বের সহযাত্রী শূন্যতার অভিব্যক্তি খোঁজে, আবার তাঁর শিল্পীমন খুঁজে বেড়ায় ম
ানবিকপরিসরের উদ্ভাসন। যেমন এই গল্পে 'সারেঙ্গের স্নেহ ক্ষুধার্তমন জোঁকের মতো ওর অন্তরের স্নেহ মমতা শুষতে ল
াগল। 'ছাত্তারের কান্নাসারেঙ্গকে ভাবনার অতলে স্তব্ধ করে দেয়। জাহাজের চলার মধ্যে গল্পকার দার্শনিক সংকেত খুঁজে
পান 'হয়তো মানুষের জীবনকে উপেক্ষা করে কাল চলছে সমাপ্তিহীন যাত্রায় অনন্ত তমিস্রার পানে।' কিন্তু গল্পকার শুধুম
াত্র আবেগ - নির্ভর বয়ান তৈরি করতে চাননি। তাই উপস্থাপনায় রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে তিনি লেখেন, সারেঙ্গ অপ্রত্যাশিত
ভাবে ত্রুদ্ধ হয়ে উঠল। হয়তো একটা বিকৃত হিংসা ঝলকে উঠেছে মনে। আসলে তার জীবনের রিক্ততা ও অপ্রাপ্তি ছাত্ত
ারের মধ্যে নিজের বিপ্রতীপ অবয়বকে দেখতে পেয়েছে।
তাই তিক্ত বেদনায় তার অন্তর যখন জ্বালা করে ওঠে, চিহায়কের ছোঁয়া লাগে বাচনে "সাগর আজ কিছু তরঙ্গায়িত।'
কলকাতা বন্দরে জাহাজ যখন নোঙর ফেলে, কয়েকজন লস্করের সঙ্গে ছাত্তারও নেমে যায়। কিন্তু করিমের জন্যে কোথাও
কোনও তীর নেই। বস্তুত তীর দেখার ভয় মৃত্যুভয়ের মতো তাড়িত করে তাকে। 'যে তীরে কোটি কোটি সাগরের স্থবির
জীবন স্নেহ মমতার শাখা - প্রশাখার বিস্তৃত হয়ে মাটির মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে" সেই তীর তার জন্যে নয় কখনও । ছ
াত্তার জাহাজ থেকে নেমে যেতে যেতে একবারেও করিমের দিকে ফিরে তাকায় না। ওয়ালীউল্লাহ্ লেখেন রিক্ততার, শূন্যত
ার কথা 'রেলিং ধরে ঝুঁকে করিম সারেঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল প্রেতের মতো আবছা হয়ে -- চোখ দুটো তার দীনতায় বীভৎস
হয়ে উছেছে।'
জীবনের কথকতার ছলে ছোটগল্প যে জীবনের দর্শনভূমি কর্ষণ করে এবং এইজন্যে করিম সারেঙ্গের মতো ব্রাত্য - জীবনও
হতে পারে যথার্থ আধার, তার প্রমাণ হিসেবে গল্পকারের এই বয়ান তুলে ধরা যায়, 'কিন্তু অন্তরের শূন্যতা কাটবে কি?
তুমি কী দিলে আমাকে, আর আমি কী দিলাম তোমাকে তার অন্তরে আর সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে সে প্রশ্ন অবিরাম ধবনিত
হবে, হোক। সব কথার উত্তর মেলে না সব সময়, প্রশ্নের কাঁটার মধ্যেই তো মানুষের জীবনের অবসান ঘটে।'

।। সাত ।।
'পরাজয়' ওয়ালীউল্লাহের কল্পনাপ্রতিভার আশর্চ্য বিচিত্রগামিতার চমৎকার নিদর্শণ। মজনু - কালু - কুলসুম আর ছমির
মিঞার মৃতদেহ বয়ানের লঘু সঞ্চরণ এদের ঘিরে। প্রান্তিক মানুষ এরা প্রত্যেক; জল - মেঘ - নৌকো তাদের জীবনে খুব
বড়ো ভূমিকা নেয়। স্থলভূমির বাস্তব যেন নয় তাদের জন্যে, নিগূঢ় অর্থে ভাসমান ওদের সত্তা ও সম্পর্ক। তাই চাওয়া - প
াওয়া কিংবা জীবন - মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে ওরা। চরে মাচা বেঁধে যারা থাকে, সুখ বা দুঃখ নিয়ে খুব বেশি
উদ্বেল হলে ওদের চলে না। স্মৃতি - বিস্মৃতি নিয়েও নয়। বয়ানের গভীর থেকে প্রচ্ছন্ন কথকস্বর হঠাৎই প্রকট হয়ে ওঠে
'দুঃখী ও গরীব বলে তাদের কাছে মৃত্যু তত অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক নয়; তাদের জীবন মর্মবিলাসে ও সুখের
মোলায়েম সুবেদী আবরণে ঘেরা নয় বলে মৃত্যুকে তারা বড় করে দেখেনা, বরঞ্চ সেটা যেন তাদের কাছে মুক্তি, অর্থশূন্য
একটানা নিষ্ফল শ্রমের অবসান।' ওদের নীরবতাও ক্ষণিক, এমনকি প্রত্নস্মৃতির অভিব্যক্তিও। তাই কুলসুমের মনের প্রান্তের
বেহুলার কাহিনি তুলোর মতো, হালকা সাদা মেঘের নিঃশব্দে উদয় হয়ে এবং তেমনি মেঘের মতো কথার হাওয়ার আব
ার মনের আকাশ থেকে মিলিয়ে যায়। বেহুলার মতো মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে ভেলায় ভেসে যাওয়ার কথা কুলসুম যে ক্ষণক

ালের জন্যে ভাবে, তাতে বুঝি, প্রান্তিক মানুষ - মানুষীর বর্তমানও মহাকালের বিপুল গ্রন্থনার অংশ।
তবে ওয়ালীউল্লাহের পাঠক বিশেষভাবে লক্ষ করেন কুলসুমের দেহ ও চোখে শূন্যতা ও স্তব্ধতার ঘন হয়ে ওঠা। গাঁয়ের দিকে ওরা নৌকো নিয়ে রওয়ানা হওয়ার কথা ভাবে যখন ছমিরের মৃতদেহ কিন্তু জীবিত দুটি পুষ ও একজন নারীর মনে কোনও বিশেষ তরঙ্গ তৈরি করে না, কেন না ওরা বাঁচে বর্তমানে। তাই গল্পকারের বিশিষ্ট দৃষ্টিতে ধরা পড়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিগন্তের পানে তাকিয়ে কুলসুমের অবিরাম স্বপ্ন দেখা 'তার ডাগর টানা চোখ স্বপ্নাবিষ্ট। থেকে থেকে উষৎ নড়েচড়ে সে যে কথা কয়ে উঠছে তাতে মনে হচ্ছে গুম হয়ে থাকা হাওয়া যেন গুমট ভেঙে বইছে, আর স্বপ্ন দেখার ফাঁকে সে স্পপ্নের কথা কয়ে উঠছে।' ওয়ালীউল্লাহের গল্পবীক্ষা এখানে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের অফুরান সম্পদ গল্পত্বের প্রধান আধেয়। নদী - মেঘ - আকাশ - ঝড় -এর মতো প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ গল্পকারের বিন্যাসের গুনে তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে এবং পরোক্ষভাবে মানবিক সম্পর্কের বিন্যাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কুলসুমের সঙ্গেকালু ও মজনুর কথোপকথনে ও ব্যবহারে রূপান্তর - প্রবণ জীবনের আভাস ফুটে উঠেছে। কিন্তু গল্পকার ভালোই জানেন, নির্মঙ্কিক নির্জনতায় মনের কামনার বগ্লা ছেড়ে দিলেও বাস্তব অনতিক্রম্য।
অবচেতনের দোলায় কিছুক্ষণের জনে উথালপাথাল হলেও কালু ও মজনু তাই কুলসুমের মোহময় শরীর থেকে নীরবে চোখফিরিয়ে নেয় আর, কুলসুমও ফিরে আসে স্বপ্নাবেশ থেকে নিজস্ব বাস্তবে। তাই চোখে উদ্‌ভ্রান্তি, অদ্ভুত আশঙ্কা নিয়ে সে 'হঠাৎ ভয়চকিত কণ্ঠে আচমকা কেঁদে উঠে ঝুঁকে সরে এসে মজনুর পা ছুঁতে লাগল ঘনঘন।' এ আসলে জীবন - সত্যের উদয় - মুহূর্ত; পুষের কামনামদির চোখের মায়ায় নারী বিভ্রান্ত হয় হয়তো, আত্মবিস্মৃত হয় না। অতএব তাৎপর্যপূর্ণভাবে নৈসর্গিক চিহ্নায়ক ব্যবহার করেন গল্পকার; বর্তমানকে গ্রথিত করে ভবিষ্যৎ - সূচক ক্রিয়াপদে 'কখন বৃষ্টি হঠাৎ ধরে গেছে। ধানের শিষ কাঁপিয়ে নদীতে ঢেউ তুলে জোর শীতল হাওয়া বইতে শু করেছে -- যে মেঘগুলো এখনো জমাট হয়ে রয়েছে। সেগুলো নিয়ে যাবে ঝেঁটিয়ে, আর এধারে আবার ঝলমল করে উঠবে সূর্যালোক।' এই সূর্যালোক হল কুলসুমের মতো নারীর অমোঘ বাস্তব; বর্ষণমুখর প্রহরের রোমান্টিক আর্দ্রতা থেকে যেখানেউত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত। অতএব বয়ানের অন্তিম বাক্য এরকম 'দুজনার (অর্থাৎ মজনু ও কালু) মুখই কাটের মতো নিস্পন্দ'। এই বিন্দুতে পৌঁছে বুঝে নিই, কেন পরাজয়, কাদের পরাজয়! পূর্ব নির্ধারিত যৌনতার আকল্পও পরাজিত হল ক্ষণিক বিভ্রমের পরাভব হওয়ার সঙ্গে - সঙ্গে।
আসলে অজস্র অপরতার প্রান্ত থেকে বারবার বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্। লক্ষ করেছেন বাস্তবের ভেতরেরয়েছে কত রহস্য, কত গোলকধাঁধা, কত অধিবিদ্যার পরিসর। মধ্যবিত্ত বর্গের গলিঘুঁজিতে নয়, তাঁর পরিক্রমা ব্রাত্যজনদের অনালোকিত পরিসরে। দেখিয়েছেন, অস্তিত্ববোধের উদ্‌ভাসনে বৌদ্ধিক বর্গের একচেটিয়া দখলদারি নেই। তাই 'রক্ত' গল্পে আবদুলকে তাড়িত করে 'অদ্ভুত শূন্যতা', 'অনাত্মীয় নিঃসঙ্গতা'। 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' গল্পে শেখ জববারের নতুন বিবিকে উপলক্ষ অসামান্যতা বাস্তবের তুমুল বিনির্মাণে প্রকাশিত হয়েছে সূচনাপর্বেই। 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' সংকলনে এবং অগ্রন্থিত ছোটগল্পগুলিতে ওয়ালুউল্লাহের পরিণত মনন কী বিপুল অজস্রতায় ব্যক্ত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ এখানে নয়। গল্পবীক্ষা ও গল্পবিশ্বের পর্যালোচনা যে শেষ পর্যন্ত সম্বোধ্যমানতার সমৃদ্ধি উন্মোচন করে, তাতেই প্রমাণিত, গল্পকার ওয়ালীউল্লাহের লিখন - বিশ্ব পুনঃপাঠের উদ্যম পর্বে - পর্বান্তরে নবীকৃত হয়ে থাকবে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com